ভূমিকা

।। ভূমিকা ।।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যকৃতি, চিন্তাধারা, জীবনদর্শন, শিল্প ভাবনা এবং জীবনের নানা তথ্য তথা সমগ্র জীবনী অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে (১) বিভূতিভূষণ (চিত্তরঞ্জন ঘোষ) (২) জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ (ডঃ তারক নাথ ঘোষ), (৩) অপুর পাঁচালী (গৌরী শংকর ভট্টাচার্য, (৪) বিভূতিভূষণ মন ও শিল্প (গোপিকা কিশোর রায় চৌধুরী) (৫) বিভূতি বিচিত্রা (চণ্ডী দাস চট্টোপাধ্যায়) (৬) বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য (সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবনী ও সাহিত্য বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে, আর কিছু অবশিষ্ট নাই এই কথা মন মানিতে চাহেনা। সাধারণ ভাবে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য যুগে যুগে সংবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হয় নব নব তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া অন্তরের পিপাসা নিবারণ করে। এখানেই সাহিত্যের চিরন্তনত্ব, ইহারই নাম মহাকালের বিচার। সমকালের সাহিত্যের সহিত চিরকালের সাহিত্যের পার্থক্য এইখানে। যদিও বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সমকালের সন্নিহিত বলিয়া এখনও মহাকালের মাপকাঠি প্রয়োগ করা সম্ভব নহে, তবু আমাদের ধারণা তথা দুঃসাহসিক বিশ্বাস এই যে আরও কয়েকটি প্রকাশের পরেও শুধু বঙ্গদেশে নহে, ভারতে নহে, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও বিভূতিভূষণের সাহিত্য অনালোচিত থাকিবেনা। এই কথার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনাই বা রচনার সবদিকগুলিই কালজয়ী হইবে। তাহা হইবেনা, কোন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাহা হয়না, হওয়া সম্ভব নহে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যকৃতির মূল কথাই হইতেছে — আমাদের ধারণায় প্রকৃতিমগ্নতা। 'মগ্ন' স্বল্পার্থে। ইহা কোন পারিভাষিক প্রয়োগ নয়। প্রকৃতি আত্মতা বলিলেও চলে, যদি তন্ময়তাকে পারিভাষিক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যায়। এই প্রকৃতি

বিভূতিভূষণের রচনায় কেবল পটভূমি নহে — প্রাণ, ততোধিক আত্মস্বরূপ। সুতরাং এই দিক হইতে বিভূতিভূষণকে বিশেষভাবে নতুন করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে এবং বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সে প্রয়োজনীয়তা পূরণের প্রয়াস।

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে এতখানি গুরুত্ব পাইবার কোন বিশেষ হেতু আছে কি? থাকিলে কোন ঐতিহাসিক সূত্রে নৈসর্গিক পরিবেশ বা বংশধারার পরিবর্তন কিংবা আর কিছুর জন্য তাহার রচনায় এই প্রকৃতিময়তার আবির্ভাব হইল? যেখানে বাস্তব পরিবেশ পারিপার্শ্বিক নানা সামাজিক — অর্থনৈতিক — রাজনৈতিক বাত্যায় বিক্ষুব্ধ, সমসাময়িক সাহিত্যিক মণ্ডলী সেই তুফানের হাওয়ায় পাল তুলিয়া নব নব বৈপ্লবিক, বাঁধনভাঙা সাহিত্য রচনায় উদ্‌গ্রীব ও উদ্‌ভ্রান্ত, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সাহিত্যের নব নব সুরের অনুরণন, দেশীয় বীণাতন্ত্রে স্পষ্ট করিতে সাধনামগ্ন — তখন বিভূতিভূষণ কেবল একা একান্তে প্রকৃতির নিগূঢ় রসে মগ্ন হইয়া গেলেন কেন? ইহা কি তাঁহার চিন্তার দুর্বলতা, সমকালীন জীবন চিত্রায়ণের অক্ষমতা, না এই জাতীয় সাহিত্য রচনার সম্বন্ধে উদ্দেশ্যমূলক অনীহা? সমসাময়িক সমস্যা পীড়িত জীবন ও সমাজের তুলনায় প্রকৃতিকে যদি তিনি স্বেচ্ছায় মুখ্য স্থান দিয়া থাকেন, এমন কি একভাবে প্রকৃতিকে লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহলে কি জীবন বিমুখ পলাতক মনোবৃত্তি বলিব? স্থান কালের চৌহদ্দির প্রেক্ষাপটে এই ও এতজ্জাতীয় প্রশ্নগুলির একান্ত ও বিশদ আলোচনা আমাদের ধারণা এখনো উপেক্ষিত। আর এই প্রশ্নগুলির সদুত্তরের উপরই বিভূতিভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্য জীবনবত্ত্ব মৌলিকত্ব তথা কালোত্তীর্ণ দিকটি নির্ভরশীল। আলোচ্যমান এই নিবন্ধে এই সূত্র ধরিয়া আমরা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচনার মধ্যে অবশ্যই বিশদ উত্তর মিলিবে তবু এইখানে বলিবার সুবিধার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষেপাকারে অবতারণা করা আবশ্যক। বিভূতিভূষণের বিরুদ্ধে বোধ হয় এক নম্বর অভিযোগ – তাহার জীবন বিমুখতা বা পলায়নী মনোবৃত্তি এই প্রশ্নটি আলোচনার পূর্বে কয়েকটি প্রতিপ্রশ্ন মনে উঠা স্বাভাবিক। 'জীবন' বলিতে অবশ্যই মানব জীবন বুঝায় কিন্তু তাহা কি কোন নির্বিশেষ সাধারণ বস্তু ? দেশের রেখায় সীমাবদ্ধ করিয়া যদি বাঙালীর জীবন ধরি তবু প্রশ্ন – শহরের না গ্রামের ? শিক্ষিত ধনীর না , অশিক্ষিত দরিদ্রের ? সমাজের কোন স্তরের, কোন শ্রেণীর মানুষের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত – চাষী বা মজুরের ? বিভূতিভূষণ সাহিত্যের বিষয় করিয়াছিলেন বাংলার পল্লী ও পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীগণকে . আমাদের গ্রামে গাঁথা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠকে। কোন শ্রেণী বিশেষের — শ্রেণী হিসাবে প্রাধান্য বিশেষত: কারখানা শ্রমিকদের সমস্যা তখনও বঙ্গদেশে , তথা ভারতে রাজনৈতিক চেতনাতে বাস্তবভাবে প্রকট হইয়া উঠে নাই। নীলকর সমস্যা হিসাবে যাহা বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে রাজনৈতিক চেতনাকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা গ্রামের, তথা কৃষকের সমস্যা। বিভূতিভূষণ ও তাহার বিষয় গ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্যাকে বিশেষ মতবাদের দিক হইতে বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপস্থাপিত করেন নাই। কেন ? কারণ তাঁহার জীবনদৃষ্টি ছিল ব্যাপক ও সামগ্রিক। জন্ম মৃত্যুর দুই সীমান্ত দিয়া বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি জীবন — তাহার মূল প্রবৃত্তিগুলি — শুধু জৈবিক নহে মানসিক বৃত্তি সমূহ-ও মূলত: অভিন্ন, সামাজিক ও মর্যাদা-ও অবস্থার তারতম্য মাত্রাগত বৈষম্য সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ মাত্রের মধ্যেই কামনার

এক এক ক্ষেত্রে এক ধরণের ঐক্য ও সমতা থাকে, আনন্দও বেদনা থাকে। বিভূতিভূষণ আনন্দ বেদনার শ্রেণী নিরপেক্ষ সামগ্রিক জীবনচেতনার ভাষ্যকার, শুধু ভাষ্যকার নহেন একাধারে কবি ও ভাষ্যকার। বস্তুত অতোধিক — ঋগ্বেদের ঋষির মত তন্ময় শিল্পী জীবন সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত বেদনা — বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল করিয়াছে, তাহা পল্লী বাংলার অপূর্ব বিচিত্র সুন্দর আকাশের মতই উদার ও সীমাহীন। এই সঙ্গেই মানুষের পাশাপাশি তথা নিবিড় অরণ্য বৃক্ষ লতা পাতা সমৃদ্ধ প্রকৃতি বিচিত্র পাদপ উদ্যানে ও গভীর অরণ্যানী — তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে — বার বার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। এই প্রকৃতিপ্রেম, সহৃদয়, ঔদার্য — গ্রাম্য সরল মানুষের সহিত গ্রামের বৃক্ষলতা অরণ্য বেষ্টিত পরিবেশের সজাগ, সচেতন সহাবস্থান এবং তাহার শিল্পায়ন কি জীবন বিমুখতা না বৃহত্তর জীবনকল্পনা ?

আরও সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে মনে হয় ইহাও দৃষ্টিগোচর হয় যে, অখণ্ড প্রকৃতির মধ্যে যেখানে মানুষ ও বৃক্ষলতা পুষ্পরাশি, সরোবর ও নদী পর্বত গুহা সন্নিহিত ক্ষেত্রে বাস করিয়া পরসারকে ভাল লাগে, সেখানে এক ধরণের সম্পূর্ণতা ও অবর্ণনীয় আত্মীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায়। আত্মার এই বিস্তার, যাহাকে আত্মীয়তা বলা হইয়াছে — তাহাকে এক অর্থে আধ্যাত্মিক কিংবা আত্মচেতনার ঊর্ধ্বায়ন। ইহা এক ধরণের নবীন জীবন জিজ্ঞাসা, যাহা এই জীবন সীমার বাহিরেও প্রসারিত, পরলোকে পরিব্যাপ্ত। জীবনকে ভারতীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মরণের ছেদরেখাকে মুছিয়া দিয়া দেখিবার ও দেখাইবার মতো দৃষ্টিও নচিকেতা বৃত্তি, অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক বিস্ময়কর জীবন অনুভবের একটি অভিনব স্মারক, জীবনকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত বিস্তৃত

করিয়া জীবনামৃত সন্ধানের যে তপস্যা, যে বহুতর প্রয়াস, তাহাকে পলায়ন বলিবার হেতু আছে কি ? অনুসজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পেশ্রাণ লক্ষই জীবনের, মনুষ্যজীবনের একমাত্র শর্ত – চিত্তের সুধার, আত্মার বুভুক্ষা নিবারণের চেষ্টা কি অপ্রয়োজনীয় ?

বিভূতিভূষণের সাহিত্য অবাস্তব – ইহাও একটি অভিযোগ। বাস্তব কথাটি যদি রিয়ালিষ্ট কথার প্রতিধ্বনি হয় আর বিভূতিভূষণকে যদি বাস্তববাদী না বলিয়া আদর্শবাদী বা আইডিয়ালিষ্ট সাহিত্যিক বলা হয় তবে সমকালের, হয়ত বা এখনকার বাজারদরে খানিকটা নীচু ভাব থাকিবে কিন্তু তিনি নিশ্চয় অসাহিত্যিক হইবেন না । হীন-ও হইবেন না, কারণ অন্যের কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথকে দলে পাইবেন তিনি। কেবল ঘটনার যথাযথ বিবৃতি বা ফটোগ্রাফিক ধর্মিতাকে বোধ হয় বাস্তবতা কেহ বলিবেনা। বাস্তবতা আসলে একটি দার্শনিক প্রত্যয়। নিয়ন্তৃ শক্তি যেখানে বস্তু বা জড় (মেটার) সেখানে বাস্তববাদিদ আর যেখানে ভাব (আইডিয়া বা মন (মাইন্ড) সেখানে আদর্শ – বাদ । এই নিরিখে কিন্তু বাংলা সাহিত্য ক্রিয়ালিষ্ট লেখকের সংখ্যা কারাগ্রসনা । যাহা হউক যদি সাধারণ অর্থেও ধরা যায় অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের জীবনের যথার্থ বেদনা ও আকাংক্ষা যাহা, তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন – এমন অভিযোগ বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে করা চলে কি ? আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন দিক হইতে যুক্তির সাহায্যে বিচার করিয়া আমাদের বিবেচনা মত সদুত্তর খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন সাহিত্যিকেরই সমগ্র রচনা সমকালের জন্য, নানা কারণে তুরীয়সৃষ্ট বিভূতিভূষণের উপন্যাসের মূল প্রকৃতি অনুধাবন করিতে সমগ্র রচনার আলোচনা করা

তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে অবশ্য সে জীবন বিষণ্ণ নয়। পথের পাঁচালীর অপুর প্রকৃতিপ্রেম অপরাজিত'র অপুর জীবন বিষণ্ণতায় রূপান্তরিত। পথের পাঁচালীতে যে পথের ইংগিত আছে অপরাজিত উপন্যাসে সেই পথের আহ্বান আরও গভীর ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি উপন্যাস মিলিয়া একটি গোটা জীবনের কল্পনা – একটি অখণ্ড জীবনদৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আরণ্যক উপন্যাসের মধ্যে বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টির এক পরম আশ্চর্য বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির পরিদৃশ্যমান জগৎ এই উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রকৃতির সৌন্দর্য একদিকে মাধুর্যময় হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে অরণ্যের গহনতা প্রকৃতির একটা রহস্যঘন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। অরণ্যের প্রকৃতি মোহিনী – কিন্তু সে কেবলমাত্র কল্যাণময়ী বা মধুরা নয়, সে মায়াবিনী – রাক্ষসীর মত মানুষকে ভুলাইয়া তাহার জীবনকে গ্রাস করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রকৃতি যেন তন্ত্রোক্ত শক্তির মত পাগলী আর মারণী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই রহস্যগভীরতার উপলব্ধি বিভূতিভূষণের কবিচেতনার এক বহুমূল্য প্রাপ্তি।

দৃষ্টি প্রদীপ উপন্যাসের জিতু হিমালয়ের কোলে পালিত। অপুর যে প্রকৃতি প্রেম, তাহাকে জীবনের প্রতি [illegible] আরও বেশী আগ্রহান্বিত করিয়াছিল। দৃষ্টি প্রদীপের জিতুর শৈশবে দেখা হিমালয়ের প্রকৃতিপ্রেম তাহাকে করিয়াছিল আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। জিতুর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি, তাহার

অসংযত প্রেম শেষ পর্যন্ত তাহাকে গৃহকোণের ঘেরা নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিজেকে সঁপিয়া দিয়া দিয়াছে। পরবাসীর মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সে অবশেষে নিভৃত গৃহে শান্তি লাভ করিয়াছে। জীবন তৃষ্ণার এই পরিণতিই উপন্যাসের জীবন দর্শন।

দৃষ্টি প্রদীপের ভিতর আধ্যাত্ম চেতনার মাঝে কোন ফাঁক ছিলনা, তবুও বস্তুজগতের সহিত ভিতর অলৌকিক দর্শনের কিছু অমিল থাকিয়াই গিয়াছিল। দেবযান' উপন্যাসে যতীন ও পুষ্পকে এক অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনার নায়ক ও নায়িকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। মৃত্যুর পরে যে জগত, সে রহস্যময় জগত সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্নের শেষ নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর এই উপন্যাসখানিতে নাই তবুও পাঠকের মন লেখকের কল্পনার সহিত মিশিয়া যাইতে কিছু মাত্র সময় লাগেনা। মৃত্যুর পরে আত্মার গতি প্রকৃতিই এই উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। বিষয়টি গুরুগম্ভীর হইলেও আত্মার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে পার্থিব মানুষের সহজ ও সাধারণ চেতনায় লেখককে এক অতি উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে। যে কল্পনা শক্তি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনকে ও পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে।

বিভূতিভূষণের জীবিতকালে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ইছামতী' তাঁহার শেষ উপন্যাস। লেখক জীবনের প্রায় গোড়া হইতেই এই উপন্যাসখানি লিখিবার জন্য তাঁহার মানসভূমি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। এই উপন্যাসখানি দীর্ঘতমও বটে।

এক ত্রিবেণী সঙ্গম পাই আমরা ইছামতীতে। গ্রাম বাংলার সোনাঝরা দিনগুলির অনাবিল মধুরতা, সাধারণ মানুষের জীবনচেতনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই তিনটিই একান্তভাবে লেখকের নিজস্ব উপলব্ধির ফল। অপুর শৈশবে প্রকৃতি চেতনার ক্রমবিকাশ যেন ভিত্তি, যতীন অবশেষে ইছামতীর ভবানী বাড়ুজ্যের মধ্যে ক্রম পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভবানী বাড়ুজ্যের অসংযত প্রেমের উপলব্ধি একটি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ থাকেনি তাহা যেন বিশ্বচেতনায় অনেক বড় ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে।

ইহার পরেই বিভূতিভূষণ সাহিত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে গেলে তাঁহার আধ্যাত্মিক বা সাহিত্য জীবনের তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাধারায় উপনীত হইবার প্রক্রিয়া জানিতে গেলে তাঁহার বাল্য কৈশোর এবং সাহিত্য জীবনের সুরু হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার জীবনলীলার গতিপথ বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। বাল্যজীবনের উদার গ্রাম প্রকৃতি,তাহার অনাবিল সৌন্দর্য, কোমল মাধুর্য সবই তাঁহার জীবন প্রকৃতি গঠনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহারই সহিত তাঁহার বাল্যজীবনে ধর্মীয় জীবনের প্রভাব এবং পিতার অনুসারী হিসাবে তাঁহার সঙ্গীত সবই তাঁহার জীবন-লীলার সঙ্গী। তাঁহার দারিদ্র্য পীড়িত বাল্যজীবনে পিতা কর্তৃক ধর্মীয় কাহিনী, গল্প সমূহের প্রতি বিভূতিভূষণের আগ্রহ সৃষ্টির ঘটনা, ও তাহাকে ধর্মীয় এবং মানসিক পরিবেশের মধ্যেই গভীর অধ্যাত্মানুভূতিমূলক রচনার প্রতি আগ্রহসৃষ্টির লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার পাঠ্যজীবন এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত সংযোগ স্থাপন, বাঙালী ভাবালুতা ও মানবতাবাদী চেতনা সব কিছুই তাঁহার বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের উন্মেষে ধীরে ধীরে মনোভূমিতে বাসা বাঁধিতে থাকে। একদিকে ভারতীয় অতীত ইতিহাসের এবং প্রাচীন বিধিব্যবস্থার প্রতি নিজের আত্মিক বন্ধনজনিত দর্শন তত্ত্ব, অপরদিকে গভীর অথচ শান্ত স্নিগ্ধ কোমল মধুর বৈষ্ণব মরমীয়া কবিদের বিশেষত: বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডী দাসের [illegible] প্রতি আত্মিক প্রভাবের লক্ষণ দেখা যায়। বিভূতিভূষণ চণ্ডী দাসের সরল ভাবময় ব্যঞ্জনা প্রধান সরল ভাষার সাহায্যে ও প্রকৃতি চিত্রণে চণ্ডী দাসকে বিশেষরূপে বিভূতিভূষণের পূর্বসূরী বলিয়া মনে হয়। কারণ ~~বিভূতিভূষণ প্রকৃতিচিত্রের পূর্বসূরী বলিয়া মনে হয়।~~ কারণ বিভূতিভূষণ প্রকৃতিচিত্রণে একান্তভাবেই বাঙালী ছিলেন। চণ্ডীদাসের মত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিভূতিভূষণ ভোগ বিলাস, বৈভবের অপেক্ষা ত্যাগ, সৌন্দর্য, নিষ্ঠা সঙ্গে প্রেমও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তাঁহার জীবন আধুনিক চিন্তাধারার অনুদৃষ্টি ছিলনা অন্য দিকে তেমনি ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবন –

দর্শনের প্রভাব এই দুই টানাপোড়েনের মিলনে সৌখিন চাকচিক্যময় আধুনিক জীবনে অপ্রকাশিত বিলাসবহুল কোন বয়নের রূপ না লইয়া এদেশের নিতান্ত আটপৌরে জীবনের লাল পাড়ওয়ালা ঢাকাই শাড়িটি তিনি বয়ন করিয়াছেন। যাহা আটপৌরে হইলেও অনুপম, যাহা নিজেই শুধু সৌন্দর্য নহে – সৌন্দর্যের দ্যোতক, যাহার বয়ন প্রতিভা জীবনের আশ্চর্য সুন্দর সূক্ষ্ম অনুভূতির অন্তর্ধ্বনিতে বারবার জীবন তন্ত্রীর মীড় ও মূর্ছনায় একটি ঢাকাই মসলিনের মত। যা উহা নিজেই সুন্দর নহে, যে উহা অঙ্গে ধারণ করে সেও সুন্দর হইয়া উঠে। তাই বিভূতিভূষণ আটপৌরে জীবন সৃষ্টির মধ্য দিয়া এক অনুপম জীবন কৃতির ঢাকাই মসলিন বুনিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্যকৃতির মূলে আছে ভারতের আধ্যাত্মদর্শন, উনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ, বিশ্বসাহিত্যের নানা আঙ্গিক নিয়ম এবং উপনিষদ, বেদ, চণ্ডীদাস, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি, ভারত পথের সাহিত্য পথিকদের প্রভাব। একদিকে যেমন তাঁহাকে প্রকৃতির মধ্যে বিস্ময় রহস্য এবং প্রকৃতির সহিত মানুষের ঐকান্তিক বন্ধনের সমর্পিতার আবেগ সঞ্চার করিয়াছেন ভারতের প্রাচীন কবিরা অনাদিকে, তেমনি প্রেরণা দিয়াছেন বিহারীলাল দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হার্ডসন, শেলী, কীটস প্রভৃতি। একদিকে তাঁহার সাহিত্যে যেমন আছে প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃতির রূপানুভবের বিস্তৃত বর্ণনা এবং বিস্ময় বোধের সাড়া অপরদিকে প্রকৃতির মধ্যে চেতনার রূপদর্শন এবং মানব চেতনার সহিত প্রকৃতি চেতনার নীরব সংযোগ। প্রকৃতির রহস্যের

মধ্যে, প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্র লীলার মধ্যে, আপন কবি প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য সাধের সংযোগ সাধন করিয়াছেন তিনি। এইভাবেই প্রকৃতির সহিত মানুষের, মানুষের ভাবনার সহিত প্রকৃতি ভাবনার এক বর্ণালী যোগসাধন করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন কবিদের প্রকৃতি প্রেমিকতার হারাইয়া যাওয়া সূত্রটিকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন রবীন্দ্র নাথ, সেই সূত্রের প্রান্ত ধরিয়া মানুষ ও প্রকৃতির যৌথ জীবন এক করিয়া সাহিত্যের রূপ রস ও বর্ণের ব্যঞ্জনার মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন বিভূতিভূষণ।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে বিষাদ, হতাশা, মৃত্যুচেতনা বোধ, নি:সঙ্গতা গভীর যৌনচারিতা সংকুল, দ্বন্দ্ব ও অন্তর্গত করিয়া তুলিয়াছিল তরুণ পাঠকগোষ্ঠীকে। যুদ্ধোত্তর ঐ যুগের বুদ্ধিজীবী, দেশের হাজার হাজার সাধারণ পাঠকচিত্তকে কিন্তু এই বৈদগ্ধ্য মুগ্ধ করা দূরে থাকুক স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই। সেই যুগের সংশয় সংকুল, পুরাতন মূল্য বোধের প্রতি আস্থাহীন, নাস্তিক্য বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির পাশেই বিভূতিভূষণ ভারতীয় জীবনরসে পুষ্ট অধ্যাত্মবস্তুনিষ্ঠ এক নতুন মন্ত্রের ও বস্তুর সাহিত্যের সহিত বাঙালী সাধারণ পাঠককে পরিচয় করাইয়া দিলেন।

বস্তুত: ভারতবর্ষের মাটিতে অধ্যাত্মচেতনার যে সঞ্জীবনী রস রহিয়াছে তাহাই বিহারী লালের কুণ্ঠিত নি:সঙ্গ প্রকৃতিপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যৌবনোচ্ছল আরও অনেক বেশী সঞ্চার করিয়া শেষে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি- চেতনায় অভিনব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই ধারা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বিভূতিভূষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিছু কিছু সমালোচক বলিয়াছেন বিভূতিভূষণ দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়াই তিনি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সাহিত্য রসিক বাঙালী পাঠক সমাজে সম্মান করিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু মহাকালের বিচারে রায় কি এই উক্তি সমর্থন করে? কল্লোলের যে শক্তিমান লেখকগোষ্ঠী আধুনিকতার কৃত্রিম সোরগোলে আত্মসমর্পণ করিয়া পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার ঝড়ো বাতাসে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শুধু কতকগুলি শহরকেই সাময়িকভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। শহরের বাহিরে যে বিরাট দেশ ও বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সহিত এই তথাকথিত আধুনিকতার কোন সংযোগ ছিল কি? দেশ ও মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যথার্থ সাহিত্য রচনা হয় না — এই ঐতিহাসিক সত্য আর একবার বুঝি নিষ্ঠুরভাবে উপলব্ধি হইল।

বিভূতিভূষণের পা ছিল দেশের মাটিতে। দেশ-মাটি-মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। এই ভালবাসার কাজল পরানো চোখেই তিনি সব কিছুকেই দেখিয়াছেন চিরকাল। তরুণ বয়সে জীবিকার টানে ব্যারাকপুর ছাড়িয়া তাঁহাকে ভাগলপুর যাইতে হইয়াছিল। নিজের গ্রাম পরিচিত প্রকৃতি ও প্রিয়জনের হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনায় তিনি অধীর হইয়াছিলেন। সেই বেদনা হইতে পথের পাঁচালীর জন্ম।

73883
23 MAR 1981
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

অবশ্য পরে যখন ভাগলপুরের বনবনান্তের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সেখানকার সহজ মানুষগুলির অপরিমেয় আন্তরিকতা ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, তখনও কিন্তু সেই ছাড়িয়া আসাদিন, প্রকৃতি ও মানুষগুলির জন্য বিভূতিভূষণের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আর তাহা হইতেই জন্ম হইয়াছে একের পর এক প্রকৃতির নীলাঞ্জন মাখানো উপন্যাসগুলি।

বিভূতিভূষণ কেন প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কী উৎস ও পটভূমি ছিল এবং তাহার মানসভূমির গঠন প্রক্রিয়াও কি ভাবে প্রকৃতি ও মানুষকে একই সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন তাহাই হইল এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য।

পুনশ্চ –

সবিশেষ উল্লেখ্য, বানান পদ্ধতিতে যে বৈপরীত্য বিশেষভাবে পরিলক্ষ্যমান তাহা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। সময় স্বল্পতাহেতু সমগ্র পাণ্ডুলিপি টাইপ করিবার জন্য দুইজন টাইপরাইটারকে দায়িত্ব দিতে বাধ্য হই। দুই টাইপরাইটারে বানানের দুই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন হওয়ার ফলশ্রুতি এই বৈপরীত্য। আমার অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।